শয়তানের ছবি

এইচ জি ওয়েলস

শয়তানের ছবি

(The Temptation of Harringay)

['The Temptation of Harringay' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'The St. Jamess Gazette' পত্রিকায়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোটগল্পের সংকলন 'The Stolen Bacillus and Other Incidents'-তে গল্পটি স্থান পায়।]

আশ্চর্য এই কাণ্ড আদৌ ঘটেছিল কি না বলা কঠিন। হ্যারিঙ্গওয়ের মুখে শোনা তো–তার কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। হ্যারিঙ্গওয়ে–আর্টিস্ট হ্যারিঙ্গওয়ে। আর্টের কিছু বুঝুক-না বুঝুক, ছবি আঁকে। নিজের কথাতেই সাতকাহন। কল্পনা বস্তুটা মগজে খুবই কম। তবুও এঁকে যায় ছবি–সে ছবি সবসময়ে যে ছবি হয়ে ওঠে না–তা জেনেও ছবি আঁকার নেশা ছাড়তে পারে না।

বিচিত্র এই কাহিনি তারই মুখে শোনা।

বিচিত্র বলে বিচিত্র! দশটা নাগাদ একদিন স্টুডিয়োতে গিয়ে হ্যারিঙ্গওয়ে আগের দিন আঁকা ইতালিয়ান অর্গানবাদকের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখছিল। শিল্পী মানুষ তো, বড্ড খুঁতখুঁতে। ছবি পছন্দ হয়নি।

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তা-ই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন, এই আপ্তবাক্যটি অনুসরণ করেই রাস্তা থেকে অর্গানবাদককে ধরে এনে ক্যানভাসের সামনে

হাঁটু গেড়ে বসিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। পয়সার খাঁকতি ছিল বাদকমশায়ের। চোঙা ঘুরিয়ে বাজনা বাজিয়ে পথে পথে দু-চার পেনি পেলেই যে বর্তে যায়, শিল্পী হ্যারিঙ্গওয়ে তাকে। কবজায় এনে ফেলেছিল সহজেই। মহৎ সৃষ্টি করতে গেলে পথের ভিখিরিদের দিকেই নজর রাখতে হয়।

হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তাকে এমনভাবে হাসতে বলেছিল যেন দেখলেই মনে হয়, পেনির প্রত্যাশায় বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু মাড়ি বার করলে চলবে না, মাড়ি আঁকার জন্যে এত মেহনত করতে বসেনি হ্যারিঙ্গওয়ে, দাবড়ানি দিয়ে তা বোঝাতে কসর করেনি শিল্পীমশায়। হাসির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে মনের অতৃপ্তি, তবেই তো ছবি খুলবে ভালো।

ব্যারেল-অর্গান নিয়ে বিদেয় হয়েছিল বাদকমশায়। টেনে ঘুমিয়ে রাত কাবার করে শিল্পীমশায়ের কিন্তু মনে হয়েছিল, ছবিটা মোটেই সুবিধের হয়নি। ঘাড়ের কাছে একটু তুলি বোলাতে পারলে মনে হয় উতরে যাবে

শুরু হল পায়চারি স্টুডিয়োর মধ্যে। নানান দিক থেকে ঘাড় কাত করে নিজের সৃষ্টিকে দেখল নানানভাবে। শেষকালে যে অশ্লীল শব্দটা উচ্চারণ করেছিল, সেটা বর্তমান কাহিনিতে বাদ দেওয়া হল।

তারপর বলেছিল নিজের মনে, নিছক একটা ছবি যদি হত, মনটা খচখচ করত না। কিন্তু জীবন্ত মানুষের ছবি এঁকে সেই ছবিকে যদি জীবন্ত করে তুলতে না পারি, তাহলে করলামটা কী? ধুত্তোর! নিশ্চয় গলদ রয়েছে আমার কল্পনা করার ক্ষমতায়, কিছুতেই কোনও ছবিকে জীবন্ত করতে পারি না।

খাঁটি কথা! হ্যারিঙ্গওয়ের মস্ত গলদ ওইখানেই–কল্পনাশক্তির ঘাটতি নিয়ে শিল্পী হওয়া কি সম্ভব?

মনে মনে তাই সমানে গজগজ করে যায় হ্যারিঙ্গওয়ে। ঝাল ঝাড়ে নিজের ওপরেই। গিরিমাটি রং দিয়ে আদমকে যেমন রঙিন করা হয়েছিল, সেইভাবেই রং দেওয়া দরকার ছবির মানুষে। কিন্তু দূর দূর! এ কি একটা ছবি হয়েছে। অথচ রাস্তায় হাঁটলেই ছবির মতোই স্টুডিয়ো-চিত্র দেখা যায়। স্টুডিয়োতে ঢুকলেই তা অন্যরকম! পালটে যায় খোকাখুকুরও!

জানলার খড়খড়ি তুলে দিল হ্যারিঙ্গওয়ে। আলো আসুক ঘরে। তারপর রং, তুলি, প্যালেট তুলে নিয়ে এল ছবির সামনে। এক পোঁচ বাদামি রং লাগালে মুখের কোণে। তারপর তন্ময় হল চোখের তারা নিয়ে। শেষকালে মনে হল চিবুকটি বড় বেশি ঔদাস্যে ভরা–ধর্মচর্চার জন্যে যে মানুষ রাত জাগে–এরকম উদাস ভাব তাকে মানায় না। ছবিটার নাম দিয়ে বসেছে কিন্তু সেইভাবেই–ধর্মচর্চার জন্যে রাত্রি জাগরণ।

কিছুক্ষণ পর আঁকার সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে পাইপ নিয়ে বসল। ধূমপান করে মাথা সাফ করা দরকার। ঠায় চেয়ে রইল ছবির দিকে। মনে হল যেন ছবির মানুষটা নাক সিটকিয়ে তাকে উপহাস করছে।

সত্যিই জান্তব ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ছবিতে। তবে যেভাবে হ্যারিঙ্গওয়ে চেয়েছিল, সেভাবে হয়নি। উপহাস ভাবটা অতিশয় সুস্পষ্ট। হেয়জ্ঞান করছে শিল্পীকে। শিল্পীর ক্ষমতায় যেন তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। ঠিক এইভাবে ছবিকে সজীব করতে চায়নি হ্যারিঙ্গওয়ে।

বাঁদিকের ভুরুটায় বিশ্বনিন্দা অতটা ফুটে ওঠেনি অবশ্য। সুতরাং ওর ওপরই চাপানো যাক আর একটু রং। কানের লতিতেও একটু রং বুলিয়ে দেয় সেই সঙ্গে–সজীবতর করে তোলার জন্যে।

এইভাবেই এখানে-সেখানে একটু করে রং ছুঁইয়ে দূরে সরে গিয়ে ঘাড় কাত করে দেখে হ্যারিঙ্গওয়ে। একটু একটু করে আগের চাইতেও জ্যান্ত হয়ে উঠছে ছবিটা ঠিকই কিন্তু মন-খুশ ছবি হচ্ছে না মোটেই। এমন কুটিল মুখ তো হ্যারিঙ্গওয়ে চায়নি। জীবনে এরকম অশুভ ভাবভরা মুখচ্ছবি কখনও আঁকেনি শিল্পীমশায়। ছবি কখনও এরকম জ্যান্তও হয়নি। তার হাতে।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় হ্যারিঙ্গওয়ে। তাচ্ছিল্যের ওই হাসি উড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত রং-তুলি চালিয়ে গেল সমানে। সে ভাবটা গেল তো স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের চাপা আগুন। এতক্ষণ এই দ্যুতি কিন্তু চোখে পড়েনি। সারা মুখখানায় যেন শয়তানি মাখানো।

কেন এরকম হল? ভুরু দুটো কি বেশি তেরচা হয়ে গেছে? খড়খড়ি আরও খুলে দিয়ে জোর আলোয় রং-তুলি নিয়ে ফের হুমড়ি খেয়ে বসল হ্যারিঙ্গওয়ে।

ক্যানভাসের ওপরে মুখটা সজীব রয়েছে যেন আত্মার প্রাণস্পন্দনে। কিন্তু পৈশাচিক ভাবটা জাগ্রত হচ্ছে কী জন্যে, কিছুতেই তা আবিষ্কার করে উঠতে পারে না হ্যারিঙ্গওয়ে। অসম্ভব! আরও এক্সপেরিমেন্ট দরকার মনে হচ্ছে। ভুরু দুটোর দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাজ্জব হয়ে যায় বেচারা। ও কি ভুরু? না অন্য কিছু? ওই জন্যেই মুখটা কি অমন নারকীয়? ধুত্তোর! রং-তুলি যখন হাতেই রয়েছে, বিকট ভুরুকে সহজ করে তোলা এমন কী শক্ত কাজ। ভুরু পালটে গেল চক্ষের নিমেষে। কিন্তু তাতেও কমল না মুখের

ভয়াবহতা –আর ওই গা-জ্বালানো তাচ্ছিল্যের হাসি! আরও শয়তান-শয়তান হয়ে ওঠে গোটা মুখটা। কী জ্বালা! কী জ্বালা! মুখের কোণটায় একটু তুলি বোলালে হয় না? শ্লেষ হাসি অমনি পালটে গিয়ে দাঁত বার-করা হাড়পিত্তি-জ্বালানো হাসি যেন নিঃশব্দে টিটকিরি দিয়ে যায় হ্যারিঙ্গওয়েকে। তাহলে গলদ আছে চোখে? যাচ্চলে! তুলিতে উঠে এসেছে টকটকে সিঁদুর রং লাগানোও হয়ে গেল ওই রং! অথচ বেশ খেয়াল ছিল, তুলছে বাদামি রং!

টকটকে লাল চোখজোড়া এখন যেন অক্ষিকোটরে পাক দিয়ে কটমট করে চেয়ে আছে। হ্যারিঙ্গওয়ের দিকে। চোখ তো নয়–আগুনের গোলক বললেই চলে।

তড়িঘড়ি বেশ খানিকটা উজ্জ্বল লাল রং-তুলি বোঝাই করে তুলে নিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। একটু যেন ভয়ত্রস্ত হয়েই ঘচাঘচ করে তুলি বুলিয়েছিল ছবির ওপর দিয়ে। আড়াআড়িভাবে। তারপরেই ঘটে গেল ভারী অদ্ভুত একটা ব্যাপার। অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! কিন্তু আদৌ তা ঘটেছিল কি না তা-ই বা কে জানে?

ছবির শয়তান ইতালিয়ান অর্গানবাদক সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে, মুখ কুঁচকে, হাত তুলে সমস্ত রং মুছে ফেললে মুখের ওপর থেকে!

পরক্ষণেই ফের খুলে গেল লাল চোখ। ফট করে ঠোঁট খোলার মতো আওয়াজও হল একটা। সুড়ত করে হাসি ভেসে গেল মুখের ওপর দিয়ে।

কথা কয়ে উঠল ছবি, ঝোঁকের মাথায় কী যে কর?

এতক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল নাকি হ্যারিঙ্গওয়ে–কিন্তু যা ঘটবার নয় তা-ই যখন ঘটে গেল, তখন আর কীসের ভয়? নিমেষে আত্মস্থ হয়ে ওঠে শিল্পীমশায়। ছবির শয়তান খুব একটা হাড়বজ্জাত হবে বলে মনে যখন হচ্ছে না, তখন কোমর বেঁধেই লাগা যাক তার সঙ্গে।

কড়া গলায় বলে হ্যারিঙ্গওয়ে, তুমিই বা কম যাও কীসে? এত নড়াচড়া কেন? মুখ ভেংচে, চোখ টিপে, ব্যঙ্গের হাসিই বা কেন?

আমি? আকাশ থেকে পড়ে যেন ছবি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।

আমি তো কিছু করিনি।

একশোবার তুমি করেছ।

আজ্ঞে না মশায়, গোলমালটা তুমিই পাকিয়েছ, বলে ছবি।

তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে হ্যারিঙ্গওয়ে, ইয়ারকি হচ্ছে?

পাগল, ওসব আমার পোষায় না।–আরে, আরে, কর কী? কর কী? আবার তুলি দিয়ে মারবে নাকি? পাগলামি ছাড়। যা সত্যি, তা শুনলে খারাপ তো লাগবেই। কিন্তু সকাল থেকে কী চেষ্টাই না করছ, আমি যা নই, ঠিক সেইভাবে আমাকে আঁকতে। নিজেই জান না কী আঁকতে চাও, দোষ আমার না তোমার?

ফটফট করো না। কী আঁকতে চাই, সে জ্ঞান আমার বিলক্ষণ আছে।

একেবারেই নেই। কস্মিনকালেও ছিল না, ছবিদের সঙ্গে তোমার প্রাণের কোনও সম্পর্কই নেই, তাই কোনও ছবিই শেষ পর্যন্ত জ্যান্ত ছবি হয়ে ওঠে না। আবছা ধারণা নিয়ে শুরু কর, তারপর চলে পরীক্ষানিরীক্ষা, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মতো রং খুলে গেল তো ভালো, নইলে নয়। ঠিক কী আঁকতে চাও, গোড়া থেকেই সেই ধারণা স্পষ্ট থাকে না বলেই কেলোর কীর্তি চালিয়ে যাও। ছ্যা! ছ্যা!

গাঁ-গাঁ করে হ্যারিঙ্গওয়ে নাকি তখন বলেছিল, আমি ছবি আঁকব আমার মর্জিমাফিক তোমার তাতে কী?

প্রেরণা ছাড়া ছবি আঁকতে তো পারবে না, একটু হতাশ হয়েই বলেছিল ছবি।

প্রেরণা নেই কোনও–বলছ? প্রেরণা!

ঘৃণায় নাক-ফাক কুঁচকে একাকার করে বলেছে ছবি, রাস্তায় যাচ্ছিল একজন অর্গানবাদক। মুখ তুলে চাইল তোমার জানলার দিকে। দেখেই প্রেরণা এসে গেল তোমার মাথায়? ধর্মচর্চার জন্যে রাত্রি জাগরণ? ফুঃ! প্রেরণার প্রত্যাশায় বসে থাক– প্রেরণা তোমার দিকে ফিরেও চায় না। দেখেই মায়া হল আমার। তাই তো ভাবলাম, যাই, কিছু জ্ঞান দিয়ে আসি।

লাল লাল চোখ মটকে মুচকি হেসে ফের বলেছিল ছবি, বেশি জেনে ছবি আঁকতে শুরু কর বলেই ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পার না। বুঝলে হাঁদারাম? জ্ঞানে মটমট করছ বলেই অজানাকে জ্ঞানের সীমানায় ঢুকতে দাও না, ছবির মধ্যে আত্মা বেচারিও ঢোকার পথ খুঁজে পায় না। গলদ তোমার এইখানেই। একটু যদি কম জানতে...

বোমার মতো ফেটে পড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। খোদ শয়তানের মুখে এ ধরনের সমালোচনা সে আশা করেনি।

বলেছিল, খবরদার! আমার স্টুডিয়োতে বসে আমাকে হেনস্থা করলে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।

বলতে বলতে তুলে ধরেছিল লাল রঙে বোঝাই শূকর-কেশের বারো নম্বর মোটা তুলিটা।

ভ্রূক্ষেপ করেনি জ্ঞানদাতা ছবি–খাঁটি শিল্পী জেনো ছেলেমানুষের মতো অজ্ঞান হয়, জ্ঞানের মটমটানি থাকে না ভেতরে। যে শিল্পী নিজের সৃষ্টি নিয়ে তত্ত্ব রচনা করে চলে, সে কিন্তু শিল্পী থাকে না-সমালোচক হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়াও দাঁড়াও! লাল রংটা তুললে কেন?

লালে লাল করে দেব বলে–লাল পরদা বানিয়ে ছাড়ব তোমাকে। আমারই স্টুডিয়োতে বসে আমাকে লেকচার দেওয়া?

শুনেই নাকি দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল ছবি–অত হড়বড় করার কী আছে? কথাটা শেষ করতে দাও?

না...

শোন, শোন, তোমার ভালো করব বলেই এসেছি আমি। প্রেরণা জিনিসটা তোমার মধ্যেই নেই। আমি জুগিয়ে যাব। কোলনের ক্যাথিড্রালের নাম শুনেছ? শয়তানের সেতু?

রাবিশ! তোমার কথা শুনে বস্তাপচা সস্তা নাম কিনে নরকে তলিয়ে যাই আর কী! নাও ধর! ফিরে যাও জাহান্নমে!

হ্যারিঙ্গওয়ের মাথায় নাকি তখন রক্ত চড়ে গিয়েছিল। একতাল লাল রং নিয়ে খুঁজে দিয়েছিল ছবির প্রাণীর মুখের মধ্যে। ভীষণ চমকে গিয়ে থুথু করে রং ফেলবার চেষ্টা করেছিল ইতালিয়ান বেচারা।

তারপরেই নাকি শুরু হয়ে গিয়েছিল অত্যাশ্চর্য ধস্তাধস্তি। লাল রং ছিটিয়ে গেছে হ্যারিঙ্গওয়ে সমানে–প্রতিবারই দুমড়ে-মুচড়ে শরীরটাকে তুলির পোঁচের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছে ছবির প্রাণী। সেই সঙ্গে দর কষাকষি চালিয়ে গেছে তারস্বরে–জোড়ানিধি পাবে হে শিল্পী! দু-দুটো উৎকৃষ্ট ছবি–বিনিময়ে যা বলব তা শুনতে হবে, কেমন? দাম পছন্দ? এক ধ্যাবড়া রং ছুঁড়ে দিয়ে জবাবটা দিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে মুখে কোনও কথা না বলে!

মিনিটকয়েক কেবল ঘচাঘচ তুলি ছোঁড়া, রং ছিটকে পড়া আর ইতালিয়ানের তারস্বরে চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায়নি। হাত আর বাহু দিয়ে বেশ কয়েকটা তুলির পোঁচ রুখে দিলেও হ্যারিঙ্গওয়ে বাধা পেরিয়ে জ্যাবড়া জ্যাবড়া রং লাগিয়ে দিয়েছিল চোখে

মুখে-নাকে। কিন্তু এভাবে এন্তার রং ছড়ালে প্যালেটের রং তো ফুরাবেই। হ্যারিঙ্গওয়ের রং শূন্য হল একসময়ে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল হাপরের মতো। ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র গড়াগড়ি দিয়ে এল কসাইখানায়। ভিজে রং ঘাড় বেয়ে টসটস করে গড়িয়ে পড়ায় খুব অস্বস্তিও হচ্ছে ছবির প্রাণীর, তা সত্ত্বেও লড়াইয়ের প্রথম টক্করে জিতেছে সে-ই। সুতরাং লাল রঙের বেধড়ক মার খেয়েও গোঁ ছাড়েনি। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেই বলেছে, দু-দুটো খাঁটি ছবির বিনিময়ে একখানা শয়তানের আত্মা-জাগানো ছবি–অমনি ধাঁ করে স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে সোজা বউয়ের সাজঘরের দিকে দৌড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে।

ফিরে এসেছিল এক টিন সবুজ এনামেল পেন্ট আর একটা মোটা বুরুশ নিয়ে। দেখেই গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল শিল্পী শয়তান, তিনটে... তিন-তিনটে সেরা ছবি বিনিময়ে একখানা...।

হ্যারিঙ্গওয়ের সবুজ রং ঝপাত করে এসে পড়েছিল শয়তানের লাল চোখে।

গার্গল করার মতো ঘড়ঘড়ে গলায় তবু মিনতি জানিয়েছিল শয়তান, চারখানা মাস্টারপিস, বিনিময়ে...।

হ্যারিঙ্গওয়ে আর দাঁড়ায়? মোটা বুরুশের এক-এক পোঁচে সবুজে সবুজ করে আনল লাল রং-ছেটানো শয়তানকে। দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে গেল গোটা ক্যানভাসটা। গড়ানে রঙের ফাঁক দিয়ে চকিতের মতো উঁকি দিয়েছিল মুখটা। পাঁচখানা মাস্টারপিস বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝপাস করে মুখের ওপরের এক পোঁচ মেরে দিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। পরক্ষণেই গড়ানে রঙের ফাঁক থেকে একখানা লাল চোখ বেরিয়ে পড়ে বিষম ঘৃণায় প্যাটপ্যাট করে

চেয়েছিল তার দিকে। হ্যারিঙ্গওয়ের হাত ঝড়ের মতো তৎক্ষণাৎ ধেয়ে গিয়েছিল সেইদিকে। অচিরেই চকচকে সবুজ এনামেল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। দ্রুত শুকিয়ে আসছে রং –তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ধরে এদিকে-সেদিকে রঙের আস্তরণ ফুলে ফুলে উঠেছিল তলার চাপে। তারপর নিথর হয়ে গেল ক্যানভাস। মৃত্যু হল ছবির।

পাইপ ধরিয়ে বসে পড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। শুধু একটা আপশোস থেকে গেছে আজও। ফোটো তুলে রাখা উচিত ছিল শয়তানের।